1:06 Vo) LTE1 Vo) LTE2 73%

Holzgrefe, J.L. (2003) 'The Humanitarian Debate', in Holzgrefe, J. L. and Keohane, R. O. (eds.) *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas.* New York: Cambridge University Press.
Farer, J. T. (2003), 'Humanitarian Intervention before September 9/11: legality and legitimacy', Holzgrefe, J. L. and Keohane, R. O.(eds.) *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas.* New York: Cambridge University Press

B.A. Political Science (Honours)
SEMESTER-VI
POL-H-DSE-T-4(B): Dissertation
Discipline Specific Elective Course; Credit-6. Full Marks-75

Course objectives:

After completion of the course the learners will be able to:

- Apply the knowledge gained through different courses in practical field.
- Solve problems related to his course of study.
- Document, calculate, analyse and interpret data.
- Deduce findings from different studies
- Write and report in standard academic formats.

Guidelines:

- The students undertaking this course shall be allotted a supervisor/mentor/guide at the beginning of the semester.
- The student shall select a topic for dissertation from any field of Political Science taking help from the supervisor/mentor/guide.
- The work completed within the stipulated time and written in standard academic format shall be submitted at the end of the semester.
- The work shall be evaluated on the basis of the written document submitted by the student and a *viva-voce* conducted on the same.

Suggested Readings:

1. Smith, K., Todd M., Waldman, J., *Doing Your Undergraduate Social Science Dissertation*, USA, Rutledge, 2009.
2. Burnett Judith , *Doing Your Social Science Dissertation*, London, Sage Publications, 2009.
3. Lovitts, Barbara E. & Wert, Ellen L., *Developing Quality Dissertations in the Social Sciences: A Graduate Student's Guide to achieving excellence*, Virginia, Stylus Publishing, 2009.

UNIVERSITY OF KALYANI

JATINDRA RAJENDRA MAHAVIDYALAYA

ESTD-1986

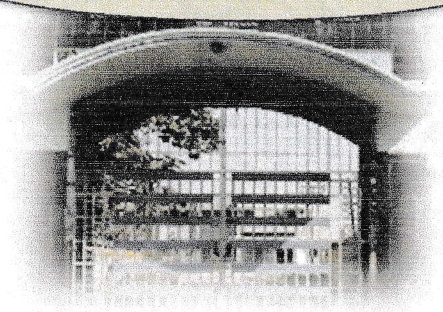

NAME: RUBINA KHATUN
STUDENT ID: B.A/21/0167
CLASS: B.A 6TH SEMESTER HONOURS
HONOURS TYPE: POLITICAL SCIENCE
ROLL: 3115221 NO: 2164885
REG: NO: 065625 OF 2021-2022
SUB: POLITICAL SCIENCE
PAPER: DSC-T-4(B) DISSERTATION

গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা : সাফল্য ও ব্যর্থতা

Rural Self-Governance
Successes and Failures

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
১। সংক্ষিপ্ত সার	1
২। ভূমিকা	2-3
৩। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ধারণা	3
৪। স্থানীয় সরকারের অর্থ	3-4
৫। ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন	4-5
৬। ভারতে পঞ্চায়েতি রাজ	6
৭। বলবন্তরাই মেহতা কমিটি	6
৮। অশোক মেহতা কমিটি	7
৯। প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও-এর সরকার	8-9
১০। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা	9-
১১। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা	10
১২। গ্রাম পঞ্চায়েত	10-12
১৩। পঞ্চায়েত সমিতি	13-14
১৪। জেলা পরিষদ	15-
১৫। গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সাফল্য	16-18
১৬। গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা	19-21
১৭। একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন	22-23
১৮। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য সূচক সদর্থক দিক	24-26
১৯। গ্রন্থ তালিকা	27

সংক্ষিপ্ত সার :-

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হল সে স্বশাসিত থাকতে চায়। একারণে জাতিগত স্বাধীনতা যেমন সে পেতে চায় তেমনি সুনির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকা, সেখানকার সে বাসিন্দা সেখানকার শাসন ব্যবস্থাতেও সে অংশ গ্রহণ করতে চায়। এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মানুষ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং তাকে ধারাবাহিক ভাবে অনুশীলন করে চলেছে।

কোন সুদূর অতীত থেকে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা গড়ে উঠেছে, মধ্যযুগেই বা সেই ধারা কতটা পরিমাণে অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষে এবিষয়ে কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং স্বাধীন ভারতে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর সাম্য এবং স্বাধীনতার আবহাওয়ার তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে কতটা সাফল্যের সাথে পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে তার অধ্যায়ন এবং অনুশীলনের লক্ষ্য নিয়েই এই প্রবন্ধ রচনা। এতে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য এবং ব্যর্থতা। বিশেষ করে সাফল্য এসে থাকলেও তাকে ঘিরে বিতর্কিত যেসব প্রশ্ন নিয়ে জনমানুষে কৌতুহল তার একটি উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টার উপর। এই প্রবন্ধ রচনায় কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ সকল অধ্যাপকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যারা এবিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান, সহযোগিতা প্রদান এবং নানা দিক নির্দেশ করে। সকল অধ্যাপকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা রইল।

ভূমিকা:-

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন হল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ধারণা বিকশিত হয়েছে। এ বিষয়ে ইকবাল নারায়ন তাঁর The Idea of Democratic decentralisation শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ সালে 'Indian Journal of political science' শীর্ষক পত্রিকার এপ্রিল জুন মাসের সংখ্যায়।

গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ক্ষমতার এই বিকেন্দ্রীকরণ এমন ভাবে হওয়া দরকার যাতে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তাদের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিক আদর্শ অনুযায়ী ক্ষমতা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হয়ে বিকেন্দ্রীভূত হবে। রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা স্থানীয় স্তরে সর্ব সাধারণের হাতে আসবে। স্থানীয় মানুষ নিজেরাই সরাসরি অংশগ্রহণ করে নিজেদের সমস্যাদির মোকাবিলা করবে এবং স্থানীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবে। এই ভাবে সর্ব সাধারণের সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ মত বুনিয়াদি ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক সরকারের সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ তৃণমূল স্তরে গ্রহণ গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করাই হল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের তাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী উচ্চতর পর্যায় থেকে নিম্নতর পর্যায় সমস্ত ক্ষমতা সুবিন্যস্তভাবে ন্যস্ত হবে। ক্ষমতার এই বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ এমন ভাবে ঘটবে, স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার গড়ে উঠবে এবং এই সরকার স্থানীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কার্যকর করবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় সরকারের উপর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে।

স্বায়ত্ত-শাসন বলতে স্ব-শাসন বা নিজেদের শাসনকে বোঝায়। এই ব্যবস্থার মূল কথা হল স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা কোন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। প্রত্যেক দেশেই জেলা, মহাকুমা, গ্রাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা এই সমস্ত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থাকে স্বায়ত্ত শাসন বলে। এ হল স্থানীয় মানুষদের দ্বারা আঞ্চলিক শাসন পরিচালনা। কোন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কোন কিছুর বিনিময়েই

তার নিজের বিষয় নিজে পরিচালনা করার অধিকার ত্যাগ করতে রাজি হয় না। এই কারণে জাতীয় স্তর ছাড়াও নিম্নতর অন্যান্য পর্যায়েও নাগরিকদের স্থানীয় সমস্যাদি সমাধানের ক্ষমতা স্বীকার করা হয়। সংক্ষেপে একেই বলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ধারণা :-

স্থানীয় এলাকার অধিবাসীদের পরিষেবামূলক কাজকর্মের দায়িত্ব এবং সংবিধানগত বিচারে আইনমূলক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন হয়। লীকক এর অভিমত অনুসারে : "The distinction between Local and central Governments lies partly in their relative constitutional positions and partly the nature of public servises performed." বলা হয় যে গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থার শোভাবে সুষ্ঠু পরিচর্যা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির জনপ্রিয়তা বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আবশ্যিক।

স্থানীয় সরকারের অর্থ :-

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন হল স্থানীয় সরকার। রাষ্ট্রের জাতীয় সরকারের থেকে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আকারে-প্রকারে ক্ষুদ্র। এর কর্তৃত্ব ও কার্য পরিচালনা নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। জেনিংস তাঁর principles of local Government Law শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : (Local Government organs) having jurisdiction not over the whole of a country but over specific portion of it." এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হ্যাম্পসন এর অভিমতও প্রণিধানযোগ্য। Local Government and urban politics শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন : "...Local authorities have clearly defined geographical boundaries, multipurpose or compendious bodies, directly elected and having independent power of raising taxation." স্বায়ত্ত-শাসনমূলক স্থানীয় সরকার স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। স্থানীয় সরকার হল স্থানীয় এলাকার এক অ-সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ। এলাকার বিষয়াদি পরিচালনার উপযোগী

প্রশাসনিক সংগঠন ও আইনগত প্রক্রিয়ার এই কর্তৃপক্ষের থাকে। এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাজকর্মে এলাকার অধিবাসীরা অংশ গ্রহণ করে। এই কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকার কাজকর্ম স্বাধীনভাবে সম্পাদন করে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের এই স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না। অনেকের অভিমত অনুযায়ী স্থানীয় সরকার হল রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সরকারেরই অংশ বিশেষ।

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন :-

(I) প্রাচীন ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন :-

প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাম পঞ্চায়েত হল পুরোপুরি ভারতীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় বৈদিক যুগ থেকে। সমকালীন ভারতে প্রশাসনের নিম্নতম স্তর হিসাবে গ্রামীণ সভা সমিতিগুলিকেই বোঝাত। প্রাচীন ভারতে সভা, সমিতি, পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নত স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল। মনুস্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের প্রাচীন পঞ্চায়েতগুলি রাজনীতিক ও বিচার বিষয়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হত। এই পঞ্চায়েতগুলি বিভিন্ন প্রচলিত প্রথা ও সামাজিক আইন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অপরাধীদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করত। সাধারণভাবে পঞ্চায়েত বলতে বোঝায় পাঁচজনে এক জায়গায় বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করা। সেকালের দিনে গ্রামের মাতব্বরা আটচালা, নাটমন্দির বা বাঁধানো বটতলায় বসে গ্রামের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজকর্মও তাঁরা এইভাবে করতেন গ্রামের অধিবাসীদের সাহায্য-সহযোগিতায়। খরা, বন্যা, মহামারির মত দৈবদুর্বিপাকেও মোকাবিলায় গ্রামের মানুষ এই পথেই এগোত। প্রাচীন ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু তাঁর The Discovery of India শীর্ষক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

(II) ব্রিটিশ আমলে স্বায়ত্ত-শাসন :-

কালক্রমে ভারতের নিজস্ব শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। ব্রিটিশের শাসনাধীনে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপ ঘটে। এই সময় পাশ্চাত্য ধাঁচে স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। বর্তমান ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তারই উত্তরসূরী বলা যায়। ইংরেজরা স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজস্ব সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে

ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে। তারা তাদের আমলাতান্ত্রিক স্বার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার ফলে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক প্রকৃতি বিনষ্ট হয়।

ব্রিটিশ আমলে দুধরনের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই দুধরনের প্রতিষ্ঠান হল — পৌর ও গ্রামীণ।

(iii) স্বাধীন ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন :-

স্বাধীন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে ভারতে সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ড. আম্বেদকর পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল : " The Love of intellectual Indians for the village community is of course infinite if not pathetic .... I hold that these village republics have been the ruination of India ... what is the village but a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism? I am glad that the Draft Constitution has discarded the village and adopted the individual as its unit." গণ পরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করার প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণে ড. আম্বেদকর এ কথা বলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও গোড়ার দিকে 'গ্রাম রাজ' ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীকে লেখা চিঠিপত্রের মাধ্যমে পণ্ডিত নেহরু তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ছিলেন পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। বিংশ শতাব্দীর ভারতে পঞ্চায়েতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি সর্বপ্রকারে উদ্যোগী হন। পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মশাসন বা স্বরাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে গান্ধীজির আগ্রহ ছিল।

ভারতে পঞ্চায়েতি রাজ :-

ভারতে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক ব্যবস্থাকে 'পঞ্চায়েতিরাজ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবিধানের সপ্তম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য তালিকায় 'স্থানীয় সরকারের' বিষয়টি উল্লিখিত আছে। তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য রাজ্য আইনসভার দ্বারা প্রণীত আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত পঞ্চায়েতি রাজ গ্রামীণ উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বলবন্তরাই মেহতা কমিটি :-

স্বাধীনতার পর ভারতের অধিকাংশ রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতিরাজ চালু করে। এ কথা ঠিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলবন্তরাই মেহতা কমিটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। এই কমিটি ১৯৫৭ সালে তার প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে অধিকতর কথা বলা হয়। সমকালীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি বিদ্যমান পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতিরাজের দুর্বলতা দূর করার ব্যবস্থা হয়। এই আইনের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয় এবং ক্ষমতা সরাসরি সাধারণ মানুষের হাতে আসে। ১৯৫৭ সালে 'বলবন্তরাই মেহতা কমিটি' নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সমূহ উল্লেখ করা আবশ্যক।

সুপারিশ সমূহ :-

(ক) ত্রিস্তর পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা — গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাস্তরে জেলা পরিষদ — প্রতিষ্ঠা। (খ) গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হবে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে; কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ গঠিত হবে পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে। (গ) এই সমস্ত সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকবে যাবতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম। (ঘ) পঞ্চায়েত সমিতি হবে কার্যনির্বাহী সংস্থা; কিন্তু জেলা পরিষদ হবে পরামর্শ প্রদান, সংযোগ সাধন এবং তত্ত্বাবধানমূলক সংস্থা। (ঙ) জেলার কালেক্টর হবেন জেলা পরিষদের সভাপতি। (চ) এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সংস্থাকে যথার্থ ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে হবে।

অশোক মেহতা কমিটি :-

১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পরাজিত হয়। জনতা দল জয়ী হয় এবং সরকার গঠন করে। পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য জনতা সরকার উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করে। তৃণমূল স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সমর্থনকে কিভাবে সুনিশ্চিত করা যায় তা সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি করা হয় অশোক মেহতাকে। এই কমিটি ১৯৭৮ সালে আগস্ট মাসে তার প্রতিবেদন পেশ করে। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে দেশব্যাপী অধিকতর শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত করার জন্য এই কমিটি ১৩২ টি সুপারিশ করে। এই কমিটির প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : পঞ্চায়েতরাজ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের খোলাখুলি অংশগ্রহণ ; ক্ষমতার অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সাংবিধানিক সুরক্ষা ; উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ প্রভৃতি।

বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ :-

আশির দশকে এলাকার উন্নয়নমূলক বিবিধ পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে উপায় পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য একাধিক কমিটি গঠন করা হয়। এই সমস্ত কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সি. এইচ. হনুমন্ত রাও ওয়ার্কিং গ্রুপ (১৯৮৪)', 'জি. ভি. কে. রাও কমিটি' (১৯৮৫), 'এল. এম. সিংভী কমিটি' (১৯৮৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে এই সমস্ত কমিটির সুপারিশ হল : স্থানীয় স্তরে গ্রামোন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হওয়া দরকার, আর্থিক দিক থেকে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান সমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে দু-তিনটি গ্রামকে নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েত গঠিত হবে ; পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোকে যুক্ত করতে হবে প্রভৃতি। বস্তুত এই সময় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থার ধারণাগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের প্রক্রিয়ার ও ক্ষমতার পরিধি সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা হয়। গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থবহ অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য।

প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও-এর সরকার :-

প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে সংবিধানবদ্ধ করার ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন গ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের সাবেকি প্রস্তাবসমূহকে ব্যাপক ভাবে পরিমার্জিত করা হয়। বিতর্কিত বিষয়াদিকে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লোকসভায় একটি সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করা হয়। এই বিলটিই চূড়ান্ত ভাবে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৯২) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯২ সালের 22 শে ডিসেম্বর লোকসভায় এবং 23 শে ডিসেম্বর রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হয়। তারপর সতেরটি রাজ্য বিধানসভার দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং ১৯৯৩ সালের 20 শে এপ্রিল বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনটি বলবৎ হয় ১৯৯৩ সালের 24 শে এপ্রিল থেকে।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে। সংবিধানের বলবৎযোগ্য অংশ হিসাবে পঞ্চায়েতিরাজ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি স্বীকৃতি লাভ করে। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাদি মোতাবেক নতুন পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকর করা রাজ্য সরকারগুলির সাংবিধানিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কিত চতুর্থ অধ্যায়ের 40 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠিত করার ব্যাপারে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে। স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সংস্থা হিসাবে কার্য সম্পাদনে সক্ষম করার জন্য পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিতে হবে। সংবিধানের 40 ধারার বক্তব্যকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেছে। ভারতে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন হল একটি বৈপ্লবিক ধারণা। দেশে তৃণমূল স্তরের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিকশিত করার ব্যাপারে এটি হল একটি বরণীয় পদক্ষেপ। এই সংবিধান সংশোধনী আইনটি হল ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছে।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে সংযুক্ত হয়েছে নতুন একটি অধ্যায় বা ভাগ। এই নতুন ভাগটি 'নবম ভাগ'। এই নতুন নবম অধ্যায়টির শিরোনাম হল 'পঞ্চায়েত সমূহ'। এই অধ্যায়ে ছিল ২৪৩ থেকে ২৪৩ (ণ) অনুচ্ছেদ সমূহ তা ছাড়া এই সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে একটি তফসিল সংবিধানে সংযুক্ত হয়েছে। এটি হল 'একাদশ তফসিল'। এই নতুন তফসিলটিতে পঞ্চায়েতের কার্যাবলী সম্পর্কিত ২৯ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্যকে বিপন্ন করেনি। স্থানীয় শাসন হল রাজ্যের বিষয়।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন হল এই রাজ্য বিষয়টির উপর একটি কেন্দ্রীয় আইন। এতদ সত্ত্বেও এই কেন্দ্রীয় আইনটি অঙ্গরাজ্যের এক্তিয়ারে আঘাত করেনি। পঞ্চায়েতের ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে পর্যাপ্ত স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বিধি ব্যবস্থা সমূহকে দু ভাগে বিভক্ত করা যায়। তবে কতকগুলি ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং কতকগুলি স্বেচ্ছামূলক। নতুন পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাসমূহকে রাজ্য আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থাদি রাজ্য আইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়াটা রাজ্যের মর্জির উপর নির্ভরশীল। স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে রাজ্য ভৌগোলিক অবস্থা, আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিচার বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায়।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা

মূলত বলবন্তরাই মেহতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। মেহতা কমিটির সুপারিশে ত্রি-স্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি স্তরের প্রতিষ্ঠান হল : প্রথম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, দ্বিতীয় স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি, এবং তৃতীয় স্তরে জেলা পরিষদ। ভারতের সকল অঙ্গরাজ্যের গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা এক রকম নয়।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা :-

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ - কে অনুসরণ করে রাজ্য সরকার কতকগুলি নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেছেন। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনটিই হল মূল আইন। পরবর্তীকালে আইনটি বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৮২, '৮৪, '৮৭ এবং 2003 সালের সংশোধনীসমূহের কথা বলা দরকার। 2007 সালে শেষ সংশোধনী গৃহীত হয়। এই আইন-কানুনের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং পরিচালিত হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত :-

সংবিধানের সাম্প্রতিক সংশোধন অনুসারে পঞ্চায়েত হল সরকার। এ হল স্থানীয় স্তরের স্বায়ত্তশাসিত সরকার। এ হল গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের আর্তি কাছের এমন একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যার হাতে সমস্ত সরকারের ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েত এবং শহরাঞ্চলের পুরসভা এখন থেকে স্থানীয় স্তরের গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করল। পঞ্চায়েত একটি যৌথ সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হয়। পঞ্চায়েত আলাদা আদালতে অভিযোগ আনতে পারে এবং পঞ্চায়েত আদালতে অভিযুক্তও হতে পারে।

গঠন :-

বর্তমান আইনে প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য এক একটি গ্রাম পঞ্চায়েত - এর সুপারিশ করা হয়েছে। গ্রাম বলতে সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামকে বোঝানো হয়েছে। একটি মৌজা বা মৌজার অংশবিশেষ, বা একাধিক সংলগ্ন মৌজাকে নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হবে। গ্রামের নাম অনুসারে রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে থাকে।

কার্যকাল :-

মূল আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৪ বছর। ১৯৮৩ সালে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ নির্বাচন করতে হবে।

পদচ্যুতি :-

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা পদচ্যুত ও হতে পারেন। মহকুমা শাসক কতকগুলি কারণের জন্য সদস্যদের পদচ্যুত করতে পারেন। এই সমস্ত কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গ্রাম পঞ্চায়েতের পর পর তিনটি সভায় গরহাজির হওয়া; নীতি বিগর্হিত কাজের জন্য ফৌজদারী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ছমাসের বেশী কারাদণ্ড ভোগ; কর, শুল্ক বা মাশুল বকেয়া রাখা প্রভৃতি। এই সমস্ত কারণের জন্য অভিযুক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সদস্য যদি এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করার সুযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই হল চূড়ান্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :-

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়-দায়িত্বের তালিকা বেশ দীর্ঘ। এই সমস্ত কার্যক্রম মূলত তিন ধরনের : (১) অবশ্য পালনীয়, (২) অন্যান্য ও (৩) স্বেচ্ছাধীন।

(১) অবশ্য পালনীয় কার্যাবলী :-

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী স্বায়ত্ত শাসনের একক হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে –

(ক) পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পানীয় জলের দূষণ রোধের ব্যবস্থা;

(খ) জনস্বাস্থ্য ও জলনিকাশের ব্যবস্থা এবং অপরিচ্ছন্নতা নিবারণ করা;

(গ) রাস্তাঘাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি করা;

(ঘ) জলপথ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামতি করা;

(ঙ) বিভিন্ন সূত্র থেকে আদায়ীকৃত গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলের উপর সম্যক নজরদারির, নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

(২) অন্যান্য কার্যাবলী :-

রাজ্য সরকার কিছু কিছু কাজকর্মের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করতে পারে। এই সমস্ত কার্যাবলীর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) কৃষি, সম্প্রসারণ, জ্বালানী ও পশুখাদ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা;

(খ) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করা;

(গ) অচিরাচরিত শক্তির উৎসসমূহ পরিচালনা করা;

(ঘ) সামাজিক বনসৃজন ও অরণ্য সংরক্ষণ করা;

(ঙ) দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা প্রভৃতি।

(৩) স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী :-

কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে থাকে। এগুলিকে স্বেচ্ছাধীন কাজ বলে। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলীর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) সমবায়ভিত্তিক কৃষি বিপণন ও অপরাপর কার্যাবলীর মধ্যে সমবায়মূলক বাণিজ্যের প্রচলন ও উন্নয়ন সাধন;

(খ) খাদি, খাদ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ;

(গ) রাস্তাঘাট আলোকিত করার ব্যবস্থা করা;

(ঘ) কুয়ো, পুকুর, বিল প্রভৃতি খনন করা;

(ঙ) পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা;

(চ) সার্বজনীন স্থানে এবং জনপথের দুধারে গাছ লাগান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ছ) কৃষকদের জন্য সরকারি ঋণের প্রাপ্তি, বিতরণ ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

পঞ্চায়েত সমিতি :-

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে সমিতি। আগেকার আঞ্চলিক পরিষদের জায়গায় পঞ্চায়েত সমিতিগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকের জন্য একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি আছে। বর্তমান পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রতিটি জেলা কতকগুলি ব্লকে বিভক্ত। একাধিক পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিয়ে প্রতিটি ব্লক গঠিত হয়। প্রত্যেক ব্লকে একটি পঞ্চায়েত সমিতি থাকে। ব্লকের নাম অনুসারে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির নামকরণ করে থাকেন।

গঠন :-

পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয় কয়েক শ্রেণীর সদস্য নিয়ে। (ক) ব্লক এলাকার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ পদাধিকারবলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন।

(খ) ব্লক এলাকা বা তার কোন অংশ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার ও লোকসভার সদস্যগণ এবং ব্লক এলাকায় বসবাসকারী রাজ্য সভার সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যপদ পান। তবে কোন মন্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন না।

(গ) ব্লক এলাকার গ্রামগুলি থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে সদস্য নির্বাচিত হন। প্রতি আড়াই হাজার ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য — এই হারে প্রতি গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে অনধিক তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতিতে সাড়ে চার হাজার ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। এইভাবে নির্ধারিত হবে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে কতজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হন। এলাকার বিধানসভার নির্বাচকরা তাঁদের নির্বাচিত করেন।

(ঘ) নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতিতে ও মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

(ঙ) কোন ব্লকের অন্তর্গত নির্বাচনী এলাকা থেকে জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যরাও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হবেন। কিন্তু জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী :-

বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতির উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। কৃষি, মৎস্যচাষ, কুটির শিল্প, খাদি, পশুপালন, সমবায় আন্দোলন, হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, গ্রামীণ ঋণ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, অপ্রচলিত প্রথানুযায়ী শিক্ষা, সামাজিক বনসৃজন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সামাজিক সমৃদ্ধি ও অন্যান্য সার্বজনীন হিতকর উদ্দেশ্য সাধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে এবং আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন করে।

ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই পঞ্চায়েত সমিতি প্রধান কাজ। তাছাড়া সমিতি স্বাধীন ভাবে কৃষি, কুটির শিল্প, সমবায় ইত্যাদির উপর পরিকল্পনা গ্রহণ ও অর্থ সাহায্য করতে পারে। রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতিকে অন্য যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। সংকটের সময় ত্রাণ সংগঠন করা সমিতির অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

নতুন পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত দায়িত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সুসংহত নগরায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন; জনস্বাস্থ্য বিভাগের হাত থেকে জল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ; পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংগঠনের পরিচালক সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ; নতুন গৃহ নির্মাণের প্ল্যান অনুমোদন প্রভৃতি। বর্ধিত এই সমস্ত দায় দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এবং স্থায়ী সমিতিগুলির পরিধিও প্রসারিত করা হয়েছে।

জেলা পরিষদ :-

গঠন :-

পঞ্চায়েতের তৃতীয় স্তর, সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে জেলা পরিষদ। দার্জিলিং ব্যতীত প্রত্যেক জেলার নাম অনুসারে রাজ্য সরকার একটি জেলা পরিষদ গঠন করে। (১) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য। (২) মন্ত্রী বাদে জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যগণ এবং জেলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যগণও পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য। (৩) তাছাড়া প্রতি ব্লক থেকে দুজন করে সদস্য পাঁচ বছরের জন্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। (৪) নতুন পঞ্চায়েত আইনে জেলা পরিষদের মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে জেলা পরিষদে প্রতি ষাট হাজার ভোটদাতা পিছু একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। ষাট হাজার থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ভোটদাতার জন্য দুজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। এক লক্ষ কুড়ি হাজারের অধিক ভোটদাতার জন্য আসন সংখ্যা হবে ~~সর্বা~~ সর্বাধিক তিন। এইভাবে নির্ধারিত হবে কোন পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদে কতজন সদস্য নির্বাচিত হবেন।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি :-

১৯৮৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুসারে জেলা পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। পদাধিকার-বলে যাঁরা জেলা পরিষদের সদস্য তাঁদের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল পাঁচ বছর। কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে কোন সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন। সদস্যদের পদচ্যুত ও করা। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কোন সদস্যকে কতকগুলি কারণে পদচ্যুত করা হয়। এই কারণগুলি হল: নীতিভ্রষ্টতা, ক্ষমতার অধিকতর অসদ্ব্যবহার; পঞ্চায়েত আইনের ১(২) ধারা মোতাবেক গঠিত কোন পৌর কর্তৃপক্ষের সদস্য হলে; আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন বলে ঘোষিত হলে; এবং পর পর তিনটি সভায় অনুমতি ছাড়াই উপস্থিত না হলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে পদাধিকারবলে যাঁরা জেলা পরিষদের সদস্য তাঁদের অপসারণের ব্যবস্থা পঞ্চায়েত আইনে নেই।

গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার সাফল্য :-

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতের কতকগুলি সফল দিক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) গ্রামীণ রাজনীতির সামাজিক ভিত্তির সম্প্রসারণ :-

নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত হয়েছে। আগেকার মত প্রভাবশালী পরিবার এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রশাসনের ক্ষমতা আর সীমাবদ্ধ নেই। ১৯৭৮ সালের আগে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনে মুষ্টিমেয় সম্পদশালী জমিদার ও উচ্চ জাতের মানুষের একাধিপত্য কায়েম ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই সাবেকী কাঠামো চলে আসছিল। এর কোন রকম রূপান্তর ঘটেনি। ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এই সাবেকী গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ধ্বংস হয়। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনে ক্ষমতা বন্টনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সমাজের নিম্নবৃত্ত ও দুর্বলতর অংশ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পায়। সমাজের অবহেলিত অংশ এখন পঞ্চায়েতি ক্ষমতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

(খ) গণমুখী প্রশাসন :-

নতুন পঞ্চায়েত আইন পঞ্চায়েত প্রশাসনকে গণমুখী করেছে। বস্তু সামাজিক ও রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল গণমুখী প্রশাসনের অপরিহার্য শর্ত বিশেষ। প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর নাম-পরিচয়ের পরিবর্তন বা আনুষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা যায়। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব ক্রমশঃ কমেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগী শক্তি হিসাবে অতিরিক্ত গ্রামসেবকগণ যুক্ত হয়েছে।

(গ) সমাজের অবহেলিত অংশের অংশগ্রহণ :-

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই ভাবে সমাজের এতদিনের অবহেলিত অংশকে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের অংশীদার করা হয়েছে। তাছাড়া তফসিলী সম্প্রদায় অধ্যুষিত কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যবস্থা অঞ্চলগুলিতে বিদ্যালয় ও গোষ্ঠী গৃহ নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচের প্রসার এবং অন্যান্য সহায়ক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঘ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণ :-

গ্রামাঞ্চলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের গঠনমূলক ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে।

(ঙ) বেকার সমস্যার মোকাবিলা :

গ্রামাঞ্চলে বেকার-সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পঞ্চায়েত গ্রামের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য সরকারী ও ব্যাঙ্ক ঋণ এর মাধ্যমে স্ব-নিযুক্তি কর্মসূচী কার্যকর করেছে। গ্রামের গরীব মানুষ পঞ্চায়েতের প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সংস্থাগুলি থেকে অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। তা ছাড়া পঞ্চায়েতগুলি গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

(চ) বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :-

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। এতৎসত্ত্বেও গ্রামের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়ে নিচ্ছে। প্রধানের নেতৃত্বে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য গ্রামবাসীদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সালিশীর কাজ করেন।

(ছ) ত্রাণ ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রকল্প রূপায়নে সক্রিয় ভূমিকা :-

বন্যাবিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজে পঞ্চায়েতগুলি প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৭৮ সালে বিধ্বংসী বন্যা পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করে। এই সময় সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর তিনটি বিশেষ কর্মসূচীর দায়িত্ব ন্যস্ত করে। এগুলি হল : (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প, (২) গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, এবং (৩) গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রকল্প। তাছাড়া পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলির উপর কতকগুলি প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

এগুলি হল: (১) সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, (২) বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, (৩) ঐ সমস্ত অঞ্চলে নলকূপ স্থাপন করা, (৪) ভূমিহীন কৃষকদের জন্য গ্রামীণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, (৫) সরকারী পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা, (৬) বেকার ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

(ঙ) খরার মোকাবিলা:

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালে বন্যার পর ১৯৮২ সালে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। ঐ অভূতপূর্ব খরার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েতগুলি সরকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সহযোগিতা করেছে।

(চ) পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা:

রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি হল: (১) প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েতকে কর-উপকর হিসাবে সংগৃহীত অর্থের সমহারে অনুদান প্রদান, (২) এলাকার সকল খাস জমি বা সরকারের পুকুর, জলাশয় প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, (৩) পঞ্চায়েত সমিতিকে ভূমি রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ অনুদান হিসাবে প্রদান, (৪) রোড সেস ও পূর্ত সেস হিসাবে জেলা স্তরে আদায়ীকৃত অর্থ জেলা পরিষদকে প্রদান; গ্রামীণ নিয়োগ সেসের আদায়ীকৃত অর্থ জেলা পরিষদকে প্রদান।

(ছ) গ্রামের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ:-

মরিস জোনস তাঁর The Government and politics in india গ্রন্থে বলেছেন যে, পঞ্চায়েতিরাজের ভিত্তিতে এক নতুন ও প্রাণবন্ত স্থানীয় সরকারের সূচনা হয়েছে। তাঁর আরও অভিমত হল যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা ও সচলতা সঞ্চারিত হয়েছে। জাতপাতের ভিত্তিতে বা জাতপাতের বিচার বিবেচনা ছাড়াই রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করছে। ড. অসিত কুমার বসু তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "পুরাতন গ্রামীণ নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়ে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠার একটা সম্ভাবনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ..... পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চিরাচরিত প্রথাগত কর্তৃত্ব ও প্রভাব অবসান ঘটছে।" পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামের মানুষের রাজনৈতিক চেতনার মান অনেকটা বাড়িয়েছে। দীন-দরিদ্র মানুষও আজ আপন অধিকারে মাথা উঁচু করে চলার প্রত্যয় পেয়েছে।

গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা :

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতিরাজের সাফল্যের খতিয়ান যথেষ্ট বিস্তৃত। তবুও এর দুর্বলতার দিকগুলিও আলোচনা করা দরকার।

(১) সংকীর্ণতা :-

বর্তমানে সংকীর্ণ দলাদলি, স্বার্থের সংঘাত, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের পরিবেশকে জটিল ও দূষিত করে ফেলেছে। তার ফলে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। মাহেশ্বরী তাঁর State Governments in India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : Panchayati Raj is in low profiles of late." ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ন সম্পর্কিত হেনরী মাদিক -এর একটি মন্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

(২) গ্রামবাসীদের উদ্যোগহীনতা :-

পঞ্চায়েতিরাজের সাফল্যের জন্য গ্রামবাসীদের সার্বিক উদ্যোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও নিরক্ষর। এই কারণে তাদের মধ্যে উদ্যোগহীনতা দেখা দেয়। ফলে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মনির্ভরশীল না হয়ে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তাই গ্রামবাসীদের আর্থিক সামর্থ্য ও শিক্ষাগত মান উন্নত করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

(৩) দুর্নীতি :-

অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত গুলি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের পথে দুর্নীতি একটি বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চায়েতের সাদাসিধে সাধারণ সদস্যদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে পঞ্চায়েতের কিছু অসাধু ও স্বার্থান্বেষী সদস্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থ সাধন, স্বজন-পোষণ ও অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগ উঠেছে এবং উঠছে। দুর্নীতি ও নিয়মভঙ্গের অভিযোগে কিছু পঞ্চায়েতকে বাতিল করা হয়েছে।

(৪) অর্থনৈতিক বৈষম্য :-

গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য বর্তমান। তার ফলে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সন্তোষজনক ভাবে কাজ করতে পারে না। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র-দুর্বল মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সফল হয়নি।

(৫) অগণতান্ত্রিক গঠন :-

রাজ্য আইনসভার ও সংসদের সদস্যরা পদাধিকার-বলে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সদস্য হন। এই সদস্যরা সাধারণত সভার কাজকর্মে নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করেন না বা করতে পারেন না। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী। বিধায়ক ও সাংসদদের পঞ্চায়েতিরাজের অন্তর্ভুক্ত করানো গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির বিরোধী। মন্ত্রীদের মত আইনসভার সদস্যদেরও গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত না করাই অভিপ্রেত। পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিধায়ক ও সাংসদদের অন্তর্ভুক্তি রাজনৈতিক দলাদলিকে উসকে দেয়, দলীয় রাজনীতির দ্বারা পঞ্চায়েতের পরিবেশ কলুষিত হয় এবং পঞ্চায়েত কর্মচারীদের কাজ করার স্বাধীনতা নষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র সরকার এ বিষয়ে সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

(৬) সদস্যদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব :-

পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রশাসন পরিচালনা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার। পঞ্চায়েতের সদস্যদের সব সময় তা থাকে না। তাই পঞ্চায়েতের সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধানরা পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র সঠিক ভাবে রক্ষা করতে পারেন না।

(৭) দলীয় রাজনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া :-

দলীয় রাজনীতির সীমাবদ্ধতা পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার সাফল্যের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। আধুনিক ভারতের জনজীবনের অধিকাংশ বিষয়েরই রাজনীতিকরণ ঘটেছে। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাও রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সামগ্রিক ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। স্বভাবতই রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা করেছে।

(৮) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব :-

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্যস্তরের রাজনীতিকদের মধ্যে আন্তরিকতা ও আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক নেতারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের কথা মুখে বলেন ও জনসভায় বক্তৃতা করেন। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান সমূহের জনপ্রতিনিধিদের হাতে অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখেন না। এ দেশের আমলাদের মধ্যেও পঞ্চায়েতিরাজের ব্যাপারে এক ধরনের সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব পঞ্চায়েতি রাজের সাফল্যের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

(৯) দায়িত্বহীনতা :-

তিন স্তরের পঞ্চায়েত সংগঠনগুলির দায়-দায়িত্ব ও কাজকর্মের সীমারেখা সব সময় সুস্পষ্ট নয়। এবং আর্থিক সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের উপযোগী নয়। এদের গঠনব্যবস্থা দায়িত্বহীনতা ও দায় এড়ানোর প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এর ফলে

(১০) সরকারি নিয়ন্ত্রণের আধিক্য :-

অভিযোগ করা হয় যে, সরকারী কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আধিক্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের পথে বাধাস্বরূপ। সরকারের খবরদারি বাড়লে গ্রামের সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং দায়িত্ববোধ হ্রাস পেতে বাধ্য।

(১১) রাজনৈতিক দলিতবাদ :-

পঞ্চায়েত এলাকার বিধায়ক ও সাংসদদের পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের সংযোগ সম্পর্ক এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলকে সুদৃঢ় করে। তার ফলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ে।

(১২) সাম্প্রতিককালে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি বহু ও বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করতে উদ্যোগ আয়োজন গ্রহণ করে। এই সমস্ত সরকারী উদ্যোগ আয়োজনের ফলে পঞ্চায়েতি সংস্থাসমূহের গুরুত্ব হানি ঘটে।

একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন :-

পঞ্চায়েতিরাজের সাফল্যের ধারণা :-

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও সফল করা দরকার। কিন্তু কিভাবে তা করা যায়, তা হল এক অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। পঞ্চায়েতি রাজের সাফল্যের স্বার্থে পঞ্চায়েতিরাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা আবশ্যক। পঞ্চায়েতি রাজ হল মোটামুটি একটি রাজনৈতিক ধারণা এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক ধারণা। এর উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং এই পথে কার্যক্ষেত্রে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও যথার্থ স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা। গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়নকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করার জন্য পঞ্চায়েতিরাজ তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনার প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করতে চায়।

পঞ্চায়েতিরাজের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন :-

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতিরাজ হল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। তবে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত প্রশাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকেই এই ব্যবস্থা বিবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির সম্মুখীন। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। এই বিষয়গুলি মূলত পঞ্চায়েতিরাজের প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কিত। যাই হোক পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পঞ্চায়েত প্রশাসনের মাধ্যমে সাম্প্রতিককালে এ ক্ষেত্রে সদর্থক উদ্যোগ আয়োজন ও মোটামুটি সন্তোষজনক সাফল্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

উন্নয়নমূলক প্রশাসন ও পঞ্চায়েতিরাজ :-

ভারতের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য গ্রামাঞ্চলের প্রশাসনের দক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রকৃতির হওয়া প্রয়োজন। জনসাধারণ নিজেরাই তাদের সরকার সংগঠিত ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারলে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সহজেই সম্ভব হবে। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে একটি সহায়ক ও সদর্থক উদ্যোগ হিসাবে সুপরিচিত। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব তার ভিত্তিতেই দেশ ও দেশবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত ও নিরাপদ হবে।

পঞ্চায়েতিরাজ ও ক্ষমতার রাজনীতি :-

পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে ওঠে স্বাধীন মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে। স্বাভাবতই স্বাধীন জনসাধারনের পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থা সমূহে ক্ষমতার রাজনীতি আসতে বাধ্য। ক্ষমতার রাজনীতি রহিত পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা বাস্তবে অসম্ভব। স্বাধীন জনগনের মধ্যে রাজনীতিক প্রক্রিয়া থাকবেই।

পঞ্চায়েত ও রাজনীতির প্রক্রিয়া :-

গনতান্ত্রিক প্রশাসনের সঙ্গে রাজনীতিক প্রক্রিয়া গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুত রাজনীতিক প্রক্রিয়া হল গনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়। জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে রাজনীতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পঞ্চায়েত স্তরের নেতা ও সরকারী আধিকারিক :-

বাস্তবে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থাকে অর্থবহ এবং সফল ও সার্থক করে তোলা দরকার। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে এলাকার অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃপক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এই সমস্ত কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত উন্নয়নমূলক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি হল এক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট স্তরের প্রাথমিক সরকার এবং আর এক দিক থেকে রাজ্য সরকারের প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। পঞ্চায়েত পর্যায়ের প্রশাসন বলতে প্রাথমিক ভাবে বোঝায় সরকারি এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক সংগঠিত করা। পঞ্চায়েত স্তরে সরকারি আধিকারিকরা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী একভাবে অহিনানুগ ভূমিকা পালন করতে পারে না। তদঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে এক ধরনের সম্পর্ক তাদের গড়ে তুলতে হয়। গনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারনাকে অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিরোধ বিতর্কের ঊর্দ্ধে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য সূচক সদর্থক দিক :

(১) নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীবিন্যাস :

প্রাচীন ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীবিন্যাস ছিল এক ধরনের। পশ্চিমবঙ্গের নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আগেকার দিনে রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিন্যাসকে ভেঙে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, গ্রামাঞ্চলের স্কুল শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে। গ্রামাঞ্চলের এই জনগোষ্ঠী দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়েছে। এই গোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলে নতুন মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত এক নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে। অনুরূপ কোন রাজনৈতিক বিবর্তন বা বিকাশ ভারতের অন্য কোন অঙ্গরাজ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

(২) তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন :

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার এই সদর্থক দিকটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। এই রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি হল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক। এই সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তথাকথিত বহু নিম্নবর্ণ বা নীচু জাতির মানুষ আছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেন। এই সুবাদে তাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, বিতর্কে যোগ দেন। এই ভাবে পারস্পরিক বিরোধ বিতর্ক ও সালিসি মীমাংসার মধ্যে যায়। অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চজাত ও নীচুজাতের মানুষের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া যায়। এই ধরনের পারস্পরিক ব্যাপক সংযোগ সম্পর্ক সূত্রে চলে আসা অনেক সামাজিক কুসংস্কারের অপমৃত্যু যায় এবং জাতপাতের ভেদাভেদের অচলায়তন অনেকাংশে ভেঙে পড়ে।

(৩) দলিতদের মর্যাদা লাভ :-

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা ও মর্যাদায় নতুন কেন্দ্র সৃষ্টি করেছে। গ্রাম বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় এ যাবৎ অনগ্রসর ও অমর্যাদায় অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করা মানুষগুলিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। পিছিয়ে পড়া ও দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত এই দলিত জনসম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি রাজের এই সাফল্য কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া পঞ্চায়েতি রাজের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনেরও আংশিক রাজনীতিকরণ সম্পাদিত হয়েছে।

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার হাত বদল :-

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে রাজনীতি ও অর্থনীতি অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মূলত এলাকার বৃহৎ ভূস্বামী ও সম্পন্ন কৃষক পরিবারগুলির দ্বারা। এই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গ্রামীণ রাজনীতি ও অর্থনীতি এখন আর সামন্তশ্রেণী বা বিত্তবান হাথীদের হাতে নেই। এই পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার সক্রিয় ও সদর্থক অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে এলাকার নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিকরণ ঘটেছে। তার ফলে প্রাধান্যকারী সম্পত্তিবান শ্রেণীর হাত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এই শ্রেণীর হাতে এসেছে। তবে এমন দাবী করা যায় না যে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। যাই-হোক এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য।

(৫) অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি :-

বিবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা রাজ্যের সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করেছে। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান সমূহের এলাকার মানুষ এখন নিজেদের অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে করেছে। গ্রাম বাংলার মানুষ প্রথম স্থানীয় গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক এই গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা আছে। এ কথা ঠিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মানুষকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতন করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতি রাজের সার্থক অবদান অনস্বীকার্য।

গ্রন্থ তালিকা :

১। অনাদিকুমার মহাপাত্র (সম্পাদিত), - ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ।

২। অমিত কুমার বসু (সম্পাদিত), - পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ।

৩। অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), - ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় ।

৪। নিমাই প্রামানিক (সম্পাদিত), - ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা ।

UNIVERSITY OF KALYANI

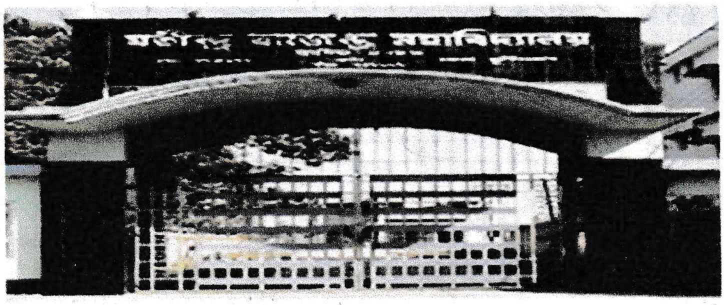

Jatindra Rajendra Mahavidyalaya

Name : Priyanka Ghosh

Student ID : B.A/21/0112

Class : B.A 6th Semester Honours

Honours Type : Political Science

Roll : 3116221 No : 2164859

Regn No : 065622

Subject : Political science

Paper : DSE-T-4(B)-Dissertation

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও তার মাধ্যমসমূহ

Political Socialization and its Agencies

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
1. সংক্ষিপ্তসার	1-4
2. কৃতজ্ঞতা স্বীকার	5
3. ভূমিকা	6-8
4. সামাজিকীকরণ : সাধারণ ধারণা	9-10
5. সামাজিকীকরণ : মাধ্যমসমূহ	10-13
6. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : ধারণা	14
7. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	15.
8. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : সংজ্ঞা	16-18
9. একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে শৈশব ও কৈশোরে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ	18-19
10. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সম্প্রসারণ	20
11. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ	21-23
12. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ	24-25

13. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের দৃষ্টিভঙ্গি	26 - 28
14. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ - এর মাধ্যমসমূহ	29 - 39
15. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা	40 - 41
16. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা	42 - 43
17. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : ভারতীয় প্রেক্ষাপট	44 - 45
18. সামগ্রিক মূল্যায়ন	46 - 48
19. গ্রন্থ তালিকা	49

সংক্ষিপ্তসার :

সাম্প্রতিককালে বৌদ্ধিক মহলে বহু চর্চিত একটি বিষয় হল সমাজবিজ্ঞান। এই সমাজবিজ্ঞান শাখা বিভিন্ন সময় তার শাখা বা ডালপালা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করেছে। এই সমাজবিজ্ঞানের এক নবীনতম শাখাশাখা হিসাবে। শুধু নবীন নয়, স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বিষয়টি। এই বিষয়টি নিয়ে আজ বৌদ্ধিক মহলে ব্যাপক রূপে চর্চা চলছে। এখন আমরা আমাদের আলোচনাকে আরো গভীরতা প্রদান করি তবে দেখতে পাবো রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত বিষয় 'রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের' মতো এক স্বতন্ত্র অধ্যায়কে। যেমন সমাজতত্ত্বে 'সামাজিকীকরণ'কে একটি স্বতন্ত্র আলোচনায় স্থান প্রদান করা হয় তেমনি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। আমাদের এই আলোচনা পত্রটির মূল বিষয় হল এই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে নিয়ে। অবশ্য একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন আমরা রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে আলোচনা এবং চর্চা চালাচ্ছি। রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব - এই দুইয়ের সম্মেলনে যে শাখাটি গড়ে উঠে সেখানে রাজনৈতিক

সামাজিকীকরণ বিষয়টি কি প্রশ্ন করলে বলবো যে এটি হল সামাজিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে তাইই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। তাহলে আমরা বলতে পারি রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্থায়িত্ব নির্মাণে বা রক্ষাণে বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংরক্ষণে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এখন পাঠকের মধ্যে একটি প্রশ্ন দানা বাঁধতে পারে যে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যাপারটি কী? তার উত্তরে বলা যায় সমাজস্থ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি; মূল্যবোধ, অনুভূতি গুলিকে সংস্কৃতি বলা হয়। আর এই সংস্কৃতির মধ্যে যখন রাজনৈতিক বিষয়টি প্রবেশ করে অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুভূতি দৃষ্টিভঙ্গিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে।

এবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে ফিরে আসা যাক। যখন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুভূতি গুলি প্রবেশ করছে তখন ব্যক্তির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঘটছে। এখন প্রশ্ন হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ নিয়ে কেন আলোচ

করবে? প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। এখন এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাব থাকে। এখন রাজ-নৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পেছনে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সদস্যদের অনুকূল মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি অতি আবশ্যক। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার যদি স্থিতিশীলতা না থাকে তবে তার মধ্যে অবস্থিত সদস্যগণের জীবন হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খলাময়। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। এখন এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তখনই আসবে যখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সদস্যগন রাজনীতির প্রতি সচেতন হয়ে উঠবে, ঠিক এখানেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ চর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে যদি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ধারণা না থাকে। সেই ব্যবস্থার প্রতি কোনো সচেতনতা না থাকে। জনগণের বিপুল অংশ যদি রাজনীতি বিমুখ হয়ে থাকে তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপটি বিকৃত হয়ে পড়ে। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে, জ্ঞান-ধারণা গড়ে তুলতে অবশ্যই আমাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে চর্চা প্রয়োজন। এই চর্চার

প্রসার তত ঘটবে তত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি বেশি মঙ্গলজনক।

এবার যদি প্রশ্ন করা হয় কিভা এই আলোচনা আমরা করব? - তবে বলা যায় রাজ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা আমাদের উচিত বিষয়টির প্রত্যেকটি স্তরে আমাদে সমানভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের রাজ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিমূর্ত ভাব গড়ে তো দরকার। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কের একটি রূপ গঠনে বিভিন্ন মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিস ব্যক্তির বিভিন্ন স্তর অনুসারে রাজনৈতিক সামাজিকীক এর মাধ্যমগুলি গুরুত্ব অর্জন করে। বিভিন্ন পর্যায়ে মাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ, রাজনৈ তিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মধ্যে সম্পর্ক কী, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতি রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটির মধ্যে সংঘটিত প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়ে সম সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। তবেই রাজনৈতিক সা জিকীকরণ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা তার নিজস্ব রূপ লাভ করবে।

(শব্দ-সংখ্যা- 500

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণাপত্রটির পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে যারা সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন আমি তাদের কাছে চিরঋণী। কারণ কয়েকটি অক্ষরের সমাবেশে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ঋণ কখনো এবং কোনোভাবেই পরিশোধ করা সম্ভব নয়। যার তত্ত্বাবধানে, আন্তরিকতা এবং উৎসাহদানের জন্য আমি এই গবেষণা পত্রটির কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছি, অর্থাৎ এই গবেষণা পত্রটির পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে মুখ্য অবদান যার, তিনি হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আমতলা তরফে মতিন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত দত্ত মহাশয়। তার অতুলনীয় তত্ত্বাবধান, অমূল্য সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আমি এই গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া আমি আমার বিভাগের সকল অধ্যাপকের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য। তবে সবশেষে বলবো ত্রুটি ও অপূর্ণতার দায় অবশ্যই আমার।

প্রিয়াঙ্কা ঘোষ
(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
মতিন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

ভূমিকা ঃ

সমাজবিজ্ঞানের এক নবীন
শাখাশাস্ত্র হিসাবে সাম্প্রতিককালে প্রাসঙ্গিক
বিষয়রূপে চর্চিত হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব না
শাখাশাস্ত্রটি। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়
রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব কী? তবে বলতে হয় রা
বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের সম্মেলনে যে নতুন শা
শাস্ত্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাকে সাধারণভ
রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বলা হয়। এই রাজনৈতি
সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজনৈ
সামাজিকীকরণ। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ
বা কেন প্রশ্নের পূর্বে আমাদের যে বিষয়টি
জেনে নেওয়া প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম
তাহলে কি এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি? সাধারণভা
বলা যায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট রা
ব্যবস্থার অধীন। এখন এই বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্য
প্রতি ব্যক্তি মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব, মনস্তা
আশাবোধ, মূল্যবোধের সমন্বয় হল রাজনৈতিক
সংস্কৃতি। মনে রাখা দরকার বিদ্যমান রাষ্ট্র
ব্যবস্থার সম্পর্কে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে
অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব থাকতে পারে।
আমাদের জানা দরকার রাজনৈতিক সামাজিকী

কী? প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন সামাজিকী-করণ হল একটি প্রক্রিয়া। তাই সাধারণ ভাষায় যদি বলি তবে বলব যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়, তাকে রাজনৈতিক সামা-জিকীকরণ বলে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল শিক্ষা গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দীক্ষিত করণের একটি পদ্ধতি।

আধুনিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিকাশ ও অগ্রগতির বিবেচনা গুরুত্ব লাভ করেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের মূল উপাদান হল নাগরিক। নাগরিকদের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাবই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংকটে নিমজ্জিত করে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য জনমানসে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূল চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করা বিশেষ প্রয়োজন। এই যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি নাগরিকদের অনুকূল চিন্তা-ধারা, মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটানো, এটিই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ নামে পরিচিত। তাই রাজনৈতিক

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ চর্চার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের সময় থেকে গুরুত্ব অর্জন করেছে। তবে প্রাচীন কালেও রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত বিষয়ের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদ্বয় প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এর লেখাতেও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তবে একথা কখনও অস্বীকার করা যাবে না যে আধুনিক কালে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ আলোচনাটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সামাজিকীকরণ : সাধারণ ধারণা

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'সামাজিকীকরণ' একটি অন্যতম ধারণা। এ বিষয়ে আলোচনা করার শুরুতে 'সমাজতত্ত্ব' বিষয়টি কি সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। সমাজতাত্ত্বিকগণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করে থাকেন। যেমন- ম্যাক্স ওয়েবার সমাজতত্ত্বকে সামাজিক ক্রিয়ার বিজ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার, এমিল ডুর্কহেইম সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

এবার সামাজিকীকরণ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে আমরা বলতে পারি সামাজিকীকরণ হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি সামাজিক জীবে পরিণত হয়। মানুষ সামাজিক হয়ে জন্মগ্রহণ করেনা। মানব শিশুর 'মানুষ' হিসাবে বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার জন্য তার চাই একটি সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ। অর্থাৎ সামাজিকীকরণ বলতে আমরা এমন এক পদ্ধতিকে বুঝি যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে।

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের সামাজিকীকরণ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে, "সামাজিকীকরণ বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার দ্বারা সমাজবদ্ধ মানব গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং স্থায়ী সংগঠনের জটিল কাঠামো সৃষ্টিতে সমর্থ হয়।"

সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ :

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তি গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তাকে সামাজিকীকরণের মাধ্যম বলা হয়।

1. পরিবার :

ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরিবারের মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণের সূচনা হয়। শিশুর চরিত্র গঠনে শিশুর চিন্তা করার ক্ষমতা, আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি গঠনে পরিবারের ভূমিকা রয়েছে। পরিবার থেকেই শিশু ভালো মন্দের শিক্ষা পায়। নিজের প্রতি যত্ন নেওয়া, নিজের আবেগকে প্রকাশ করা, অন্যকে সাহায্য করা, ভালোবাসা জ্ঞাপন প্রভৃতি যে পরিবার থেকে পেয়ে থাকে। পরিবার

থেকে শিশু কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়। যেমন- বাবা-মা ও গুরুজনদের সাথে সম্পর্ক। তাই পরিবারকে শিশুর প্রাথমিক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে অভিহিত করা যায়।

2. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচলিত নানা দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ফলে তাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সামাজিকীকরণ ঘটে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সু-নাগরিকে পরিণত হয়।

3. বন্ধু গোষ্ঠী :

সমবয়সীদের গোষ্ঠী বা বন্ধু গোষ্ঠী শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে। অপরের সাথে কীভাবে মেলামেশা করতে হয়, অপরকে সহযোগীতা করার প্রবণতা প্রভৃতি শিশু বন্ধু-গোষ্ঠীর সাথে মেলামেশার মাধ্যমে পেয়ে থাকে। বন্ধু গোষ্ঠীতে শিশু প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হওয়া, সমতা সম্পর্কে অবহিত হয়।

4. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান :

বস্তুত ধর্ম ব্যক্তিকে পরধর্ম সহিষ্ণুতা, পরমত সহিষ্ণুতা, এবং সংযম হতে শেখায়। ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ উপযোগী। ধর্মীয় সমাবেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তি যেসব উপদেশ পেয়ে থাকে তা সামাজিকীকরণে বিশেষ সহায়ক ।

5. পেশাগত সংঘ :

পেশাগত সংঘ হল ব্যক্তির পেশাগত ও বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের কেন্দ্র। এখানে ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে এবং সে তার কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে থাকে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বোধের শিক্ষা, বাস্তবতার শিক্ষা, আদান-প্রদানের শিক্ষা প্রভৃতির সাথে ব্যক্তি পরিচিত হন। আবার ব্যক্তি তার কর্মস্থল থেকে নিয়মানুবর্তিতা শেখে। এইভাবে কর্মস্থলের দ্বারা ব্যক্তির সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণতা লাভ করে ।

6. গণমাধ্যম :

আধুনিক বিকশিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র, মোবাইল, ইন্টারনেট

প্রভৃতি গনমাধ্যমের উদাহরন। এগুলি বিভিন্ন ঘটনা, সমস্যা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করে ব্যক্তির ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে। গনমাধ্যমের দ্বারা ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে এবং সচেতন হয়ে ওঠে। বর্তমানে ব্যক্তির উপর গনমাধ্যমের সরাসরি প্রভাব সদর্থক ও নঞর্থক ভূমিকা নেয়।

7. রাষ্ট্র :

সমাজে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বমূলক, সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তির অধিকার, কর্তব্য প্রভৃতিকে সুনিশ্চিত করে এবং নাগরিকদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান থেকে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্যের ধারণা, জাতীয় সংহতির ধারণা, জাতীয় সংস্কৃতির ধারণা প্রভৃতি পেয়ে থাকে। ব্যক্তির রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজের কর্তব্য, দায়িত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : ধারণা

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক চর্চিত বিষয় হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশের নাগরিকগণের মধ্যে একটি সমর্থন সূচক মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন। নইলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিপন্ন হবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও সাফল্য বহুলাংশে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপর নির্ভর করে।

রাজনৈতিক শিক্ষার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলা হয়। অর্থাৎ এটি হল একটি প্রক্রিয়া, যার ফলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জিত হয় এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মানবসমাজ, মানবজাতির মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ব্যক্তির মনে রাজনৈতিক জ্ঞান ধারণা গড়ে তোলে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে সচেতন করে তোলে। এইভাবে সামাজিকীকরণ রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : ঐতিহাসিক পটভূমি

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বহু চর্চিত একটি ধারণা। তবে একথা আমরা বলতে পারি রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একেবারে আধুনিক ধারণা নয়। প্রাচীনকালেও এ বিষয়ে আলোচনা চলেছে, পরোক্ষ ভাবে। প্রাচীন গ্রীসে চিন্তাবিদদ্বয় প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিষয় উল্লেখ ছিল। আবার ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদী ধারণাতে নিজ মতাদর্শের অনুকূলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার কথা পাই। আবার বিংশ শতাব্দী দ্বিতীয় দশকের শেষে এবং তৃতীয় দশকের শুরুতে চার্লস মেরিয়াম-এর নাগরিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের কথা উল্লেখ করা যায়।

তবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ধারণাটি প্রথম সুসংবদ্ধ ভাবে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান হার্বার্ট হাইম্যান তাঁর 1959 সালে "Political Socialization" নামক গ্রন্থে। পরবর্তীকালে চার্লস হাইম্যান, অধ্যাপক ডেভিড, ফ্রেড গ্রীন, চার্লস মেরিয়াম তাদের গবেষণার মাধ্যমে তারা এই বিষয়ে আলোকপাত করেন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : সংজ্ঞা

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান, তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। এর দ্বারা ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজের সাথে একাত্ম হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বিভি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হল —

অ্যালান বল তাঁর "Modern Politics and Government" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করাই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ।

S. L. Wasby-র মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্য রাজনৈতিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক ধ্যান এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নয় তার আগেও নাগরি রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অংশ ছিল।

অ্যালমন্ড ও পাওয়েল তাঁদের "Comparative Politics" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সম্ভব।

রবার্ট ইস্টন এবং জ্যাক ডেনিস তাঁদের "The Child's Image of Government" শীর্ষক রচনায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি বিশেষ পন্থা-একথা বলেছেন। সমাজ এই পন্থে রাজনৈতিক জ্ঞান, মনোভাব, রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত করে।

ফ্রেড গ্রিনস্টেইন - সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে ব্যাখ্যা করেছেন। সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল সচেতনভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কর্তৃক অন্যের মধ্যে রাজনৈতিক তথ্য, মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা সঞ্চারের একটি প্রক্রিয়া। ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল আনুষ্ঠানিক, অ-আনুষ্ঠানিক, সচেতন ও অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার প্রক্রিয়া।

সুতরাং, বলা যায়, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আনুষ্ঠানিক এবং অ-আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে

সমাজের সদস্যদের নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সংস্কারের চেষ্টা করা হয়।

একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে শৈশব ও কৈশোরে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ :

অধ্যাপক অ্যালান বলের মতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। তবে তার পূর্বে মানবজীবনের কোন পর্যায়ে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া অধিক কার্যকরী হয় সে নিয়ে আলোচনা করা যাক। "The Politics of the Developing Areas" গ্রন্থে অ্যালমন্ড ও কোলম্যান-এর অভিমত হল - শৈশবই হল ব্যক্তিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট করানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কিন্তু ভারত ও অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কৈশোর কালটিকে অধিক উপযুক্ত বলে মনে করা। তবে কৈশোর-এর পর-বর্তী পর্বেও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা অস্বীকার করা যায় না, তবে প্রকৃত পক্ষে একথা বলা যায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শৈশব ও কৈশোর উভয়-পর্বের প্রভাব প্রতি-ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি শৈশবে পরিবার সূত্রে পরিবার সূত্রে কোনো রাজনৈতিক দল সম্পর্কে পক্ষ-পাতমূলক ধারণা পোষণ করতে পারে। আবার

পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা, চাকরি, বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেলামেশার ফলে তার মধ্যে সেই দল সম্বন্ধে বিপরীত মনোভাব সঞ্চারিত হতে পারে। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে আজীবনকাল ধরে চলা অভিজ্ঞতা বলা যায়।

আবার একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যক্তির সারা জীবন ধরে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া প্রবাহিত হয়। কেবলমাত্র শৈশব নয়, সারা জীবন ব্যাপী এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ব্যক্তিজীবনের কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মাধ্যম ও তার ভূমিকা দ্বারা ব্যক্তির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। তাই বলা হয় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একটি নিত্য প্রবাহমান প্রক্রিয়া।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে দুটি মুখ্য উপাদান বর্তমান। যথা- অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক সম্পর্কিত ধারণাকে বিচার বিবেচনা করে, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসমূহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক সংযুক্তিকরণ এই সকল বিষয়ের উপরও নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সঞ্চারণ :

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে তিনটি প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায়। সেগুলি হল - অনুকরণ, নির্দেশ এবং প্রেরণা। অনুকরণ প্রবণতাটি শিশুদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিশু অজ্ঞাতসারে তার পিতা, মাতা ও বাড়ির বড়োদের পছন্দগুলিকে অনুকরণ করে। কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্কের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারা অনুকরণ, নির্দেশ এবং প্রেরণার সং-মিশ্রণ। নির্দেশের উদাহরণ হিসেবে রাজনৈতিক শিক্ষা, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আলোচনা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে প্রেরণা সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিক্ষকের কাছ থেকে প্রেরণার মাধ্যমে শিশু পরবর্তীকালে সুনাগরিক হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাতে পারে। অনেকের মতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সঞ্চারণের ক্ষেত্রে উপাদান বা পদ্ধতিগুলি শৈশব রাজনীতিক সামাজিকীকরণের অবিভক্ত। আর এই সমগ্র সামাজিকীকরণের অবিভক্ত অপরিহার্যভাবে প্রাসঙ্গিক।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাজনৈতিক জীবন প্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সম্ভব হয়। এখন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সেগুলি হল —

প্রথমত,

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত,

এই প্রক্রিয়ার দ্বারা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

তৃতীয়ত,

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বয়সের ও স্তরের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও বিশ্বাস গড়ে তোলা।

চতুর্থত,

স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ব্যক্তির মধ্যে যখন থেকে বিভিন্ন মাধ্যম

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাজনৈতিক জীবন বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সম্ভব হয়। এখন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সেগুলি হল —

প্রথমত,
রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত,
এই প্রক্রিয়ার দ্বারা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

তৃতীয়ত,
রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বয়সের ও স্তরের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও বিশ্বাস গড়ে তোলা।

চতুর্থত,
স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ লোককে বিভিন্ন মাধ্যম

কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমবয়সী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম সংগঠন প্রভৃতি।

পঞ্চমত,

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির সমগ্র জীবনব্যাপী অব্যাহত একটি প্রক্রিয়া।

ষষ্ঠত,

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ-এর প্রকৃতি অনেকাংশে পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পরিবেশ স্থূল সমরূপ ও নমনীয় পরিবেশ।

সপ্তমত,

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলতে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ, মূল্যবোধ, বা রাজনৈতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত করণের প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় না।

অষ্টমত,

রাজনীতিক সামাজিকীকরণ মূলত রাজনীতি সংক্রান্ত তথ্য, ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণার আত্মীকরণ। এর দ্বারা ব্যক্তির রাজনৈতিক সত্তা তৈরি হয়।

নবমত,

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলির প্রকৃতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি স্থিতিশীল হয় তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট থাকে নতুবা মাধ্যমগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে।

দশমত,

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন দুই প্রকার হতে পারে। সুস্পষ্ট ধরণ বলতে বোঝায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবোধ, বিশ্বাস, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারিত হওয়া। অন্যদিকে অ-রাজনীতিক মনোভাব ও মূল্যবোধের সঞ্চার যখন বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তখন তা প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ।

একাদশত,

বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর বহুলাংশে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ-এর মাধ্যমগুলি নির্ভরশীল।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ :

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটির ধরন সমজাতীয় নয়। প্রক্রিয়াটি সকল ক্ষেত্রে এক রকমের নয়। তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে প্রকারভেদ করেছেন। সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলতে সপরিকল্পিতভাবে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ব্যাপক অর্থে সামাজিকীকরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল সুপরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত, প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি - বেসরকারী যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দুই ধরনের হতে পারে। যথা — সুস্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ। সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায় যেখানে রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি সঞ্চারিত হয়। যেমন- উদাহরণ হিসাবে রাজনৈতিক দলের কথা বলা যেতে পারে। আবার রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস যদি পরোক্ষভাবে সঞ্চারিত হয় তখন তা প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ, যেমন- শিশুর কর্তৃত্বের প্রতি মনোভাব, আনুগত্য।

তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরন সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন দুটিই অধিকতর ফলপ্রসূ। তবে এগুলোতে আরও দুটি ধরন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, উদ্দেশ্যমূলক - শিক্ষক ছাত্রকে আইন মান্য করতে শেখালে সেখানে উদ্দেশ্যমূলক সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ ঘটে। আবার শিশু যখন পুলিশ দ্বারা পরিবারের সদস্যদের নিগ্রহ হতে দেখে তখন শিশুর মধ্যে পুলিশের প্রতি একটা ভয় সৃষ্টি হয়, যা উদ্দেশ্যহীন সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ। একইভাবে শিশু যখন বড়োদের আনুগত্য দেখায় তখন তা উদ্দেশ্যমূলক প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ। আবার শিশু যখন খেলাধুলায় যোগদান করে নিজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তখন উদ্দেশ্যহীন প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ ঘটে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যথা-

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক প্রয়াসের দ্বারা মূল্যবোধ সঞ্চারের প্রবণতা এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিকীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন বাহন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির সহযোগীতা, বিরোধীতা বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি :

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি সেগুলি হল - উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্কস-বাদী দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

১) উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি :

আমরা এমনেই জেনে এসেছি সামাজিকীকরণ-এর সময় নিয়ে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বিশ্লেষণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। এখন উদারনৈতিক ধারণা অনুসারে মানব জীবনের তিনটি পর্যায়। যথা — শৈশবের গোড়ার দিক, শেষের দিক এবং কৈশোর এই তিনটি পর্যায়ে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পাদিত হয়।

উদারনৈতিক দৃষ্টিকোন অনুসারে কম বয়সের শিশুর মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যের ধারণা সঞ্চারিত হয়, মানবজীবনের শৈশবকালে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি একটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। শৈশবের শেষের দিকে পরিবার থেকে পাওয়া জ্ঞান-ধারণা পর্যাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে থাকে। পরে কৈশোরে ব্যক্তি বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে পরিশীলিত হয়।

শৈশব এবং কৈশোরে মানুষ প্রাপ্তবয়স্কের রাজনৈতিক জীবনের উপাদানগুলি আহরণ করে। ব্যক্তি শৈশবে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা অর্জন তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে কৈশোর কালে। মানবজীবনের এই পর্যায়টি এমন এক পর্যায় যেখানে জীবনচক্রের বিবিধ ঘটনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। যেমন - বিবাহ, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে এটি একটি স্বাভাবিক ও অপরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যার ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়।

উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণে সামাজিকীকরণে পরিবার নামক মাধ্যমটিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মূল্যবোধসমূহ পরিবারের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। শৈশব - কৈশোরে পরিবারের মাধ্যমেই ব্যক্তি মানুষের সামাজিকীকরণের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই পর্যায়টি সর্বাধিক গঠনমূলক পর্যায়। মানসিক গঠনের মূল কার্যক্রম এই সময়ে সম্পাদিত হয়।

ঘ) মার্কসবাদী বা বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি :

বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সামাজিকীকরণ হল বিশেষভাবে সুশৃঙ্খল, সুপরিকল্পিত এবং প্রবাহমান প্রক্রিয়া। এই মতবাদ কোমল জীবনে রাজনৈতিক জ্ঞান আহরণকে অস্বীকার করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় সামাজিকীকরণ প্রাধান্যকারী শ্রেণি থেকে অধস্তন শ্রেণীসমূহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত এই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রতিক মডেল এবং তার প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক তথ্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আবেগ-উদ্বেগসহ কোমল-কৈশোরের পরবর্তী বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থা কথা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থার অভিজ্ঞতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে গণমাধ্যমকে পরিবার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মূল্য দেওয়া হয়। তবে মার্কসবাদীদের মতে গণমাধ্যমগুলি সাধারণত রক্ষণশীল প্রকৃতির। এগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : মাধ্যমসমূহ

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের আলোচনাতে আমরা জেনে গেছি রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও অনুভূতি সঞ্চারের প্রক্রিয়াই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। এখানে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠতে পারে কিশোর, যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ঐ অনুভূতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ কিভাবে সঞ্চারিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে বলা যায় রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস সঞ্চারে কতকগুলি মাধ্যমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে সাহায্যকারী মাধ্যমগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা —

1. প্রাথমিক গোষ্ঠী
2. গৌণ গোষ্ঠী।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে কোন মাধ্যম সর্বাধিক ফলপ্রসূ সে বিষয়ে সার্বিক মূল্যায়ন কঠিন। প্রাথমিকভাবে পরিবার এবং পরবর্তীতে বাইরের মেলামেশার ফলে একে একে অন্য মাধ্যমগুলির প্রভাব পড়তে শুরু করে।

১. প্রাথমিক গোষ্ঠী ঃ

(ক) পরিবার ঃ

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে পরি
নামক মাধ্যমটিকে সামাজিকীকরণের অঙ্কুর ঘর
হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পরিবারই কোনো ব্যক্তির
কাছে সামাজিকীকরণের প্রথম মাধ্যমরূপে প্রতি
হয়। শিশুর কাছে পরিবারই হল বহির্বিশ্বের জান
স্বরূপ। শিশু রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রথম
শিক্ষা গ্রহণ করে এই পরিবার থেকে।

পরিবারের মধ্যে শিশুর প্রচ্ছন্ন এবং সুস্
সামাজিকীকরণ ঘটে। শিশু তার পরিবারে গুরুজনদে
প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করে তা পরবর্তীতে রাজনৈ
আনুগত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। পরিবার শিশুকে
পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে যুক্ত করে শি
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করে।

ডেভিস-এর মতে, পরিবার ব্যক্তির মৌলি
চাহিদাপূরণের প্রধান উৎস, তাই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব
গঠনে পরিবার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। পি
মাতার সাথে একাত্ম হয়ে শিশু রাজনৈতিক ব্যব
সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। রাজনৈতিক
সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া শিশুর প্রাথমিক
জীবন থেকেই শুরু হয়।

পরিবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর মাধ্যম। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে অন্যান্য নাগরিক এবং রাজনীতিবিদ ও সরকারি পদাধিকারীদের প্রতি মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। শিশু অপরিণত বয়স থেকেই পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, যা ভবিষ্যতে সাহায্য করে।

লরেন্স উইলি ফ্রান্সের একটি গ্রামের সমীক্ষার মাধ্যমে এই বক্তব্যটি প্রদান করেছেন যে, রাজনীতির প্রতি পরিবারের বিরূপ মনোভাব শিশুর মধ্যেও বিপরীত মনোভাব সৃষ্টি করে।

তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ-এর ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকা সব ক্ষেত্রে সমান নয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পরিবারের সদস্যগণ তাদের পারিবারিক রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তন করতে চায় এবং পারেও।

জেমস ডেভিস -এর মতে, পরিবারের বাইরে থেকে উদ্ভূত কোনো সংকট পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে নবীন সদস্যদের দৈহিক কল্যাণে সংকট সৃষ্টি করে। পিতার বেকারত্ব পরিবারের কর্তারূপে তার প্রভাব হ্রাস করে।

পারিবারের ভূমিকার সমালোচনা:

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মা
হিসাবে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও
এর কতকগুলি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন—

প্রথমত,
পারিবারিক সামাজিকীকরণ সাধারণত
রক্ষণশীল প্রকৃতির।

দ্বিতীয়ত,
অনেক সময় পরিবারের সদস্য হিসাবে
সন্তানরা পিতামাতার রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টি
ভঙ্গির প্রতি অনাগ্রহ ও অনবহিত থাকে। সেক্ষেত্রে
পরিবার নামক মাধ্যমটির গুরুত্ব হ্রাস পায়।

তৃতীয়ত,
শিশুর অপরিণত অবস্থায় পরিবার
থেকে পাওয়া মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

চতুর্থত,
পরিণত বয়সে ব্যক্তি পরিবার ছাড়া
অন্যান্য সংস্থা-যেমন: বন্ধুগোষ্ঠী, গণমাধ্যম প্রভৃতি
দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়।

পঞ্চমত,
অনেকসময় পরিবারের রাজনৈতিক মূল্য
বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ভিত্তি। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল -এর মতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের পরে যে মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে তা হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়। মৌলিক মূল্যবোধসমূহ, প্রচলিত ন্যায়নীতির ধারণা, রাজনীতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করার কারণ হল ছাত্রছাত্রীরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যয়িত করে। পাঠ্যসূচীতে পৌর-বিদ্যা বিষয়ক পাঠ্যসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচির বাইরে নানা কাজে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। ফলে পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপরীত মূল্যবোধ; মনোভাব -এর সঞ্চার ঘটাতে পারে।

উক্তন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকাটি পর্যালোচনা করা দরকার। শিক্ষা স্থানে কর্তৃত্বসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্তৃত্বসম্পন্ন মনোভাব গড়ে তোলে। এর মাধ্যমের সাহায্যে পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে।

অধ্যাপক অ্যালান বল বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের ব্যাপারে বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপ-সংস্কৃতি উদ্ভবের পেছনে বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা আছে।

অ্যালমন ও ভার্বা মনে করেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট আদান-প্রদান এবং নিজেদের সামাজিক পরিবেশের বিকাশ সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা এবং পরিবেশে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষিত মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। এখানে শিক্ষার মাধ্যমে আঞ্চলিক আনুগত্য সৃষ্টি হয়।

(গ) অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী :

আধুনিককালে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সামাজিক জীবনধারার পরিবর্তন ঘটেছে, জীবনের বিবিধ দাবি পূরণের জন্য ও সমস্যা সমাধান-এর জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। স্বাতন্ত্র্য অর্জন ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে নিজেকে প্রস্তুত করতে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর ভূমিকা রয়েছে। এই গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিকভাবে ভাবে গঠিত হয়। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত, মনোভাব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী যদি রাজনীতি বিষয়ে উৎসাহী হয় তবেই সেক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সহজে সাফল্য লাভ করে। যেমন- উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, আমেরিকার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজনীতির প্রতি উৎসাহ কম, সেক্ষেত্রে সেখানে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় না। সমবয়স্কদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমতার সম্পর্ক। ফলে এর মাধ্যমে গোষ্ঠীর মধ্যে সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক কিছু আয়ত্ত করতে পারে। অন্তরঙ্গ বন্ধুমহল রাজনৈতিক মতামত গঠনে যুবকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

II. গৌণ গোষ্ঠী :

(ক) পেশাগত সংগঠন :

বর্তমানে সকল ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পে
সংঘ সৃষ্টি হয়। যেমন - বণিক সংঘ, কৃষক সংঘ, শ্রমি
সংঘ ইত্যাদি। এগুলি সাধারণত পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষ
স্বার্থে। তবে আধুনিককালে আমরা পেশাগত সংঘগুলির
দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখব প্রত্যেক সংগঠনই
কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। সংগঠনের
সদস্যদের মধ্যে দলীয় মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তার করে
নির্বাচনের সময় এই সমস্ত সংঘ পৃষ্ঠপোষক দলের হ
নির্বাচনী রাজনীতিতে এবং নির্বাচনী প্রচারকার্যে অংশগ্র
করে। আবার সংঘগুলি পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ করতে
দলীয় তহবিলে অর্থ প্রদান করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক
দলগুলিও এইসমস্ত পেশাগত সংঘের সদস্যদের মধ্যে নিজে
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের উদ্যোগ নেয়। তাছাড়া
পেশাগত সংগঠনগুলি নিজেদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষ
জন্য একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলের মতো ব্যাপকভা
প্রচারকার্য চালায় তেমনি আবার ধর্মঘট, বিক্ষোভ, আ
লন করেও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। পেশাগ
সংগঠন নিজেদের রাজনৈতিক মনোভাব, অনুভূতি, দৃষ্টি
সঞ্চার করে গোষ্ঠীর সদস্যদের রাজনৈতিকভাবে
সামাজিকীকৃত করবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নে

(ঘ) গণমাধ্যম :

সাম্প্রতিককালে এই মোবাইল, ইন্টারনেট-এর যুগে গণমাধ্যমগুলি রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেট, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার প্রভৃতি গণমাধ্যমের উদাহরণ। এই মাধ্যমগুলি প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ঘটনা ও সেই সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে খুব দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণ অবহিত হয়, তাদের চিন্তাভাবনা বাড়ে, রাজনৈতিক চেতনার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়ে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় গণমাধ্যমগুলি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের মতামত, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গিকে জনগণের মধ্যে প্রচার করে গণমাধ্যমগুলি। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই ধরনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি গণমাধ্যমগুলি মালিকের রাজনৈতিক মূল্যবোধ গণমাধ্যমগুলিতে তুলে ধরে, নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর মূল্যবোধও তুলে ধরা হয় এতে। তাই এটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় যে গণমাধ্যমগুলি যদি সরকার বা কোনো স্বার্থগোষ্ঠী, অথবা কোনো বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাহলে জনসাধারণের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে সঠিক ও স্বাধীন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় গণমাধ্যমগুলি।

(গ) রাজনৈতিক দল :

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল বহুসংখ্যক মানুষকে রাজনৈতিক জীবনের বহুমুখী কার্যকলাপে সংযুক্ত করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল তার মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সম্প্রসারিত হবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মনোভাব সুদৃঢ় হবে। রাজনৈতিক দল মাত্রই একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ, মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাহক। নাগরিকদের প্রতি রাজনৈতিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুভূতির সঞ্চারই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থার সহায়ক হবে, নাকি পরিবর্তনকামী হবে তা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংযোগ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল দৈনন্দিন জীবনে জনসাধারণকে রাজনৈতিক বিষয়, ধ্যান ধারণা, সমস্যা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করে তোলে। জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও তাদের উপর বিশেষ প্রভাবশালী নেতার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের সাহায্যে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক মনোভাবের সঞ্চার ঘটে, যা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সহায়ক।

(ঘ) ধর্মীয় সংগঠন :

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে ধর্মীয় সংগঠন-এর ভূমিকা কথাটি কিছু অবাক করার মতো হলেও বর্তমানে এটাই সত্যি। ভারতবর্ষের মতো দেশ যেখানে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর যতই গুরুত্ব আরোপ করা হোক না কেন, তবুও কোনো কোনো দেশে রাজনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধ্যান-ধারণার বিরোধের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, আবার ধর্মীয় মূল্যবোধ নাগরিকদের মধ্যে যে নৈতিকতার বিকাশ ঘটায় তা রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের, বিশ্বাস, মনোভাব প্রভৃতি ধর্মীয় বিচার বিবেচনার দ্বারা বিবেচিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে বিভিন্ন মাধ্যমগুলির কোনোটাই এককভাবে ভূমিকা পালন করে না। এক্ষেত্রে মাধ্যমগুলি পরস্পর যুক্ত এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান। এগুলিকে কখনো বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক নয় কারণ একটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন মাধ্যমগুলি একসা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তবে মা মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে মাধ্যমগুলির মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মাধ্যমগুলির মধ্যে সমন্বয়ের প্রভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে রাজনৈতিক সামা জিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি স্বাধীনতা লা করেছে। একসময় এই দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজ নৈতিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের পর তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তির রাজনৈতিক কাঠামোকে অনুসরণ করে। আবার তাদের নিজস্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো রয়েছে। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগু আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান কর প্রয়োজন। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি একটি নিরবচ্ছিন্ন

প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারাবাহিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটলে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

আবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সকল স্তরে সমানভাবে ঘটে না। সরকার যখন বিভিন্ন মাধ্যমগুলির দ্বারা উপসংস্কৃতিকে মূল জাতীয় স্রোতের অভিমুখী করে তুলতে চাই তখন উপসংস্কৃতির নেতারা বিরোধীতা করেন। তখন স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতি বিনষ্টের আশঙ্কা থাকে। ফলে বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছেদকামী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই জাতীয় বিরোধের সুযোগ নিয়ে বাইরের কিছু স্বার্থান্বেষী চক্রের শক্তি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পেছনে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জোর প্রয়োজন। কারণ ক্ষমতাবান সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা :

সাধারণভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধ, মনোভাব, চিন্তাধারার আলোকে ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করণের প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে তার সদস্যদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সামাজিকীকরণকে একটি রক্ষণশীল প্রক্রিয়া রূপে বিবেচনা করার কারণ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এই প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন উপাদান জড়িত থাকে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি সামাজিক উপাদান, ভৌগোলিক সচলতা, ব্যক্তির রাজনৈতিক নেতাদের উপর বয়স্কদের সামাজিকীকরণের প্রভাব প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূল্যবোধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতায় সাহায্য করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে পারেনা

সামাজিকীকরণ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যবোধ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত থাকতে পারে আবার পরিবর্তনও ঘটতে পারে। কিন্তু সকল সমাজে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না সামাজিকীকরণের। এই ধারাবাহিকতার অনস্তিত্ব থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ কখনও কখনও উপসংস্কৃতির প্রবণতা সৃষ্টি করে। সামাজিকীকরণের নতুন মাধ্যম, বিদ্যমান মাধ্যমসমূহের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন, পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে উপসংস্কৃতিকে ত্বরান্বিত করে।

সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পরিবর্তনের সাথে যুক্ত। বহু পরিবার আছে যারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতায় উৎসাহী। আবার অনেক পরিবার এর বিরোধী। রাজনৈতিক জীবন ও কার্যধারার সঙ্গে রাজনৈতিক দীক্ষিতকরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাধারণত প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক দিক থেকে দীক্ষিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরন : ভারতীয় প্রেক্ষাপট

আধুনিক সমাজে, তার রাজ্য রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অ সমাজ এবং রাজনীতির সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ি রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। প্রতিটি সমাজব্যবস্থা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করে। বিভিন্ন গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপে দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে ভারতে কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ গড়ে ওঠে। ভারতে রাজনৈতিক সামা জিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারকার্য পরিচাল এবং তার সাথে সাথে নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতি অঙ্গীকার গড়ে তোলা। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে প্রতি ব্যক্তির আসক্তি বা অনিহার কিছু ক্ষেত্র বর্তমান অন্তরঙ্গ বন্ধুমহল, পারিবারিক পরিবেশ, রাজনৈ দল প্রভৃতি। ভারতে জাতপাত, শ্রেণি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্র তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। প্রচারকার্যের মাধ্যমে তারা নাগরিকদের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে আরো বেশি মজবুতবদ্ধ অথবা সংশ্লি মনোভাবকে পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বর্তমানে ভারতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ-এর প্রেক্ষাপট নির্মাণে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তি, জাতীয় দল, আঞ্চলিক দল ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারে নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ সঞ্চারিত করে। ভারতের দিকে তাকালে দেখতে পাবো বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দল-এর নেতারা জনগণের মধ্যে মতাদর্শগত পুস্তক-পুস্তিকা, সভাসমিতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের আদর্শকে প্রচার করছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত ও আদর্শকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালায়।

একদা ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষিত সকল ব্যক্তিকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থ-লোভকদের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। তবে বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হওয়ার স্বার্থে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজেদের অভিমত প্রসারে নাগরিকদের নিজেদের স্বার্থ অনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সচেষ্ট করতে চায়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : সামগ্রিক মূল্যায়ন :

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব আলোচনায় আজ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ নামক বিষয়টি বহু চর্চিত একটি বিষয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ মূলত রাজনীতি প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, জ্ঞান-ধারণার আত্মীকরণ। এখন এই ধারণাটি বিশ্লেষণ করে বলা যায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সচেতন করে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সত্তা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের দ্বারা।

এখন পরিশেষে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলির ভূমিকা বা গুরুত্ব নিয়ে যদি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যায় তাহলে বলা যায় ব্যক্তির রাজনৈতিক দিক থেকে সামাজিকীকৃত হওয়ার পেছনে মাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় কোন মাধ্যমটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তবে বলা যায় ব্যক্তির জীবন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। ব্যক্তি তার জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় যেমন পরিবারের মধ্যে অবস্থান করে তেমনি পরবর্তীতে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলে। সুতরাং কোনো একটি মাধ্যমের কথা নির্দিষ্টভাবে বলা অসম্ভব

আবার এই দিক থেকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ-এর মাধ্যমগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্তমান। ব্যক্তি তার সমগ্র জীবনব্যাপী রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অব্যাহত থাকে। যেমন- পরিবার থেকে ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যে ধারণা প্রাপ্ত হয় পরবর্তীতে অন্যান্য মাধ্যমের সংস্পর্শে এসে তার পরিবর্তন ঘটতে পারে। সুতরাং, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি নিরবচ্ছিন্ন গতিশীল প্রক্রিয়া।

একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত জনগণ সুখে-শান্তিতে তখনই জীবন অতিবাহিত করবে যখন বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি একটি স্থিতিশীল রূপ ধারণ করবে। এখন এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ফলে যখন ব্যক্তিমনে একটি স্থায়ী, সুস্পষ্ট, সচেতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হবে তখনই রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থিতিশীলতা লাভ করবে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপায়গুলি যদি নমনীয় হয় এবং পারস্পরিক যোগসূত্রের দ্বারা অব্যাহত থাকে তবে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিরাপদ ও নিশ্চিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সকল স্তরে সমানভাবে ঘটেনা। কোনভাবে ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে যে ধ্যান-ধারণা শেখে, যে আচার-আচরণ আয়ত্ত করে, কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের প্রতি সজাগ হয়ে ওঠে; পরবর্তীকালে অন্য কোনো মাধ্যমের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। আবার তৃতীয় বিশ্বের দেশ যদি আমরা ভারতের দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখব যে ভারতে নাগরিকদের রাজনৈতিক দিক থেকে সামাজিকীকৃত করতে রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকদের মধ্যে দিয়ে তোলা হয়। তবে আজ একবিংশ শতকে এসে দাঁড়িয়েও ভারতের জাতপাত ভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় অনেক মানুষই রাজনীতি সম্পর্কে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব বহন করে চলেছে। আজও বৃহৎসংখ্যক জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার ঘটেনি। তবে পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনীতি তার মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জনগণকে সচেতন করতে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা অনুসরণে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

গ্রন্থ তালিকা

i. চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদিত), 'রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি', একুশে কলকাতা, 2002, পৃঃ → 380-375

ii. রায়, সচ্চিদানন্দ (সম্পাদিত), 'রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ইতিবৃত্তান্ত : তত্ত্ব ও প্রয়োগ', সেন্ট্রাল প্রেস, 2017, পৃঃ → 20-31

iii. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, 'রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব', সুহৃদ পাবলিকেশন, 1997, পৃঃ → 385-402

iv. ঘোষ, নির্মলকান্তি ও ঘোষ প্রিতম, 'রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব', শ্রীভূমি পাবলিকেশন, 2001, পৃঃ → 214-270

v. সরকার, কল্যাণ কুমার, 'রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব', নবোদয় পাবলিকেশন, 2013, পৃঃ → 167-187